নির্বাচনী ব্যয়হ্রাস ও নির্বাচনী বিরোধের দ্রুত নিস্পত্তি: গণপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের অপরিহার্য পূর্বশর্ত

ড. বদিউল আলম মুজমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (৯ অক্টোবর, ২০০৬)

একটি সুখী, সমৃদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাংলাদেশ অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার ৩৫ বছর পরও এ সকল আকাঙ্ক্ষা আজ বহুলাংশে অপূর্ণ রয়ে গেছে। এ অপূর্ণতার একটি বড় কারণ হলো আমাদের রাজনীতিতে ক্রমবর্ধমানহারে কালো টাকা ও পেশীশক্তির ব্যবহার তথা দুর্বৃত্তায়ন। দুবৃত্তায়নের ফলে সাধারণ জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পেলেও আমাদের জাতীয় সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এছাড়াও রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের কারণে অসৎ ও অযোগ্য ব্যক্তিরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেয়েছে, যা আমাদের বহু কষ্টার্জিত গণতন্ত্রকে আজ চরম হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণ ঘটাতে হলে আমাদের রাজনীতিতে টাকার অশুভ প্রভাব দূর করতে হবে। একই সাথে নির্বাচনী বিরোধের দ্রুত নিস্পত্তি করতে হবে যাতে নির্বাচনী বৈতরনী পার হওয়ার ক্ষেত্রে কেউ অন্যায় করে পার পেয়ে যেতে না পারে। এই নিবন্ধের উদ্দেশ্যে হলো নির্বাচনী ব্যয় ও নির্বাচনী বিরোধ সম্পর্কিত বিদ্যমান আইনি বিধানের বিশ্লেষণ, এই সকল বিধান কতটুকু মেনে চলা হয় তা অনুসন্ধান এবং ব্যত্যয়ের প্রতিকারে ভবিষ্যৎ করণীয় চিহ্নিতকরণ।

গণপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

গণতন্ত্র হলো জনগণের নিজেদের বা তাদের সম্মতির শাসন। জনগণ যেখানে সরাসরিভাবে অথবা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে সেখানেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিরাজমান। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের আশা-আকাক্ষা ও তাদের স্বার্থের প্রতিফলন ঘটে। যেহেতু গণতন্ত্র হলো জনগণের তন্ত্র, তাই এ পদ্ধতিতে ব্যক্তি ও পরিবারতন্ত্রের কোন অবকাশ থাকে না।

প্রাচীন গ্রীসে সরাসরি গণতন্ত্রের (direct democracy) চর্চা শুরু হলেও বর্তমান সময়ের জন্য তা অনুপযোগী। আধুনিক বিশ্বে মূলত প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রই (representative democracy) চর্চা করা হয়। বিকশিত গণতন্ত্রে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র কার্যকারিতা প্রদর্শন করলেও, অনেক স্বল্পোন্নত দেশে এ ব্যবস্থা তেমন সফলতা অর্জন করতে পারে নি। অনেক দেশে, জর্জ বার্ণার্ড শ'র ভাষায়, গণতন্ত্রের শ্লোগান হয়ে পড়েছে সস্তা অপশাসনের শেষ আশ্রয় স্থল। এ সকল দেশে গণতন্ত্র বহুলাংশে নির্বাচন-সর্বস্ব আনুষ্ঠানিকতায় রূপান্তরিত হয়েছে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নির্বাচনই গণতন্ত্র নয় – নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মাত্র। নির্বাচন গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় (necessary), কিন্তু নির্বাচনই গণতন্ত্রের জন্য যথেষ্ট (sufficient) নয়।

সত্যিকারের গণপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

(১) অবাধ, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা;
(২) ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর ও কোনরূপ প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি;
(৩) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে সত্যিকারের ক্ষমতা অর্পন, আইন পরিষদের সার্বভৌমত্ব ও কার্যকারিতা এবং ক্ষমতার অন্য কোন কেন্দ্রবিন্দুর অবর্তমানতা;
(৪) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কার্যকর বিধান এবং তাদের স্বীয় দায়িত্বে নিবিষ্টতা;
(৫) সকল নাগরিকের জন্য পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সমসুযোগ ও সমঅধিকারের নিশ্চয়তা; এবং
(৬) ক্ষমতার বিভাজন ও চেকস এণ্ড ব্যালেন্সেসের বিধান।

সত্যিকারের গণপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচন অবশ্যই পূর্বশর্ত। তবে নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন প্রতিযোগিতামূলক। প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (level playing field) প্রয়োজন। আর লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক নির্বাচনী ব্যয় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাচনী বিরোধের দ্রুত নিস্পত্তিকরণ।

নির্বাচনী ব্যয় ও বিরোধ সম্পর্কে আইনী বিধান

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ দ্বারা নির্বাচনী ব্যয় ও বিরোধ নিয়ন্ত্রিত হয়। উপরিউক্ত আদেশের IIIA অধ্যায়ের অধীনে ৪৪এ, ৪৪এএ, ৪৪বি, ৪৪বিবি, ৪৪সি, ৪৪সিসি, ৪৪সিসিসি ও ৪৪ডি অনুচ্ছেদ নির্বাচনী ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ৪৪এএ অনুযায়ী মনোনয়ন প্রত্যাহারের ৭ দিন পর প্রত্যেক প্রার্থী তার নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস নির্দিষ্ট ছকে (১৭এ) রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা দিতে হয়। ৪৪বি অনুচ্ছেদে নির্বাচনী ব্যয়ের উর্ধ্বসীমা ৫ লক্ষ টাকা। প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর নিজ ব্যয়, সমর্থকদের ব্যয় ও দল কর্তৃক ব্যয় এ উর্ধ্বসীমার অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন খাতে নির্বাচনী ব্যয় করা যাবে নির্ধারিত করা হয়েছে তাও এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে। নির্বাচনী ব্যয় ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে নির্বাহ করারও আইনী বাধ্যবাধকতা রয়েছে (অনুচ্ছেদ ৪৪বিবি)। অনুচ্ছেদ ৪৪সি অনুযায়ী, নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট ছকে প্রত্যেক প্রার্থী তার নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করবেন। নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছে এসকল দলের জন্যও, অনুচ্ছেদ ৪৪সিসি অনুযায়ী, নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিল

করা বাধ্যতামূলক। রিটার্নিং অফিসার এ সকল তথ্য এক বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন এবং ৪৪ডি অনুযায়ী, যে কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট ফি-এর বিনিময়ে এ সকল তথ্য পেতে পারেন।

নির্বাচনী ব্যয়ের ক্ষেত্রে আইনের একটি বিরাট ফাঁক-ফোকর রয়ে গিয়েছে। আইনে কোথাও বলা নেই কবে থেকে নির্বাচনী ব্যয় গণনা শুরু হবে। ফলে নির্বাচনের বহু পূর্ব থেকেই প্রার্থীরা ও তাদের পৃষ্ঠপোষকরা অর্থ ব্যয় করা শুরু করেন। তাই নির্বাচন শুরু হওয়ার আগেই প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নির্বাচনী ব্যয়সীমা বহুগুণে ছাড়িয়ে যায়। এছাড়াও শোডাউন এবং টাকার বিনিময়ে ভোট কেনার মতো বহু অনাকাঙ্ক্ষিত খাতে বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় করা হয়, যে ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন কোনরূপ উচ্চবাচ্যও করেন না।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর ৫ম পরিচ্ছেদের অনুচ্ছেদ ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১ ও ৭২ নির্বাচনী বিরোধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আইনের বিধানানুযায়ী, নির্বাচিত প্রার্থীর নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হবার ৪৫ দিনের মধ্যে নির্বাচনী বিরোধ সম্পর্কিত মামলা হাইকোর্টে দায়ের করতে হয়। অনুচ্ছেদ ৫৭(৬)-এ হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ৬ মাসের মধ্যে মামলা নিস্পত্তি করার আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বেঞ্চের অনুমতিক্রমে আপীল বিভাগে আপীল দায়ের করা যায় (অনুচ্ছেদ ৬২)।

নির্বাচনী ব্যয় ও বিরোধ সম্পর্কিত আইনী বিধানগুলোর লঙ্ঘন *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* ১৯৭২-এর ৭৩ ও ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এসকল বিধানের লঙ্ঘনকে আইনে 'দুর্নীতিমূলক কার্যক্রম' (corrupt practice) এবং 'বেআইনী কার্যক্রম (illegal practice) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যার শাস্তি দুই থেকে সাত বছরের সশ্রম কারাদন্ড। নির্বাচনী মামলার ক্ষেত্রে, অনুচ্ছেদ ৬২ অনুযায়ী, হাইকোর্ট নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা এবং এমনকি গোটা নির্বাচন বাতিল করতে পারেন। যদি আদালত মনে করে যে, কোন ব্যক্তির *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* ১৯৭২ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা লঙ্ঘনের এবং নির্বাচনে ব্যাপক দুর্নীতিমূলক ও বেআইনী কার্যক্রমের ফলে নির্বাচনের ফলাফল গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেক্ষেত্রে গোটা নির্বাচন বাতিল করার এখতিয়ার আদালতকে দেয়া হয়েছে।

নির্বাচনী ব্যয় ও বিরোধ সম্পর্কিত আইনী বিধানের কার্যকারিতা

নির্বাচনী ব্যয় ও বিরোধ সম্পর্কিত আইনী বিধান বর্তমানে প্রায় সম্পূর্ণ অকার্যকর। আমাদের নির্বাচন কমিশন এ সকল বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে অসফল। দূর্ভাগ্যবশত আইনী বিধানগুলোর কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে কমিশন আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টাও চালান না। কমিশন তার পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষনের দায়িত্বও পালন করেন না। নাগরিকদের পক্ষ থেকে এসব বিষয়ে তথ্য চেয়ে অনুরোধ করলে কমিশন তার প্রতি কর্ণপাতও করেন না। এক কথায়, জনস্বার্থ রক্ষা করতে আমাদের নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

একথা সকলেরই জানা যে, গত দু'টি সংসদ নির্বাচনে কোন বিজয়ী প্রার্থীরই নির্বাচনী ব্যয় ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। অর্থাৎ দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেক নির্বাচিত সংসদ সদস্যই মিথ্যাচার দিয়ে আইন প্রণেতা হিসেবে তাদের যাত্রা শুরু করেন। ফলে গোড়াতেই আইন প্রণেতারা আইন ভঙ্গকারীতে পরিণত হন। এ অপরাধের জন্য আজ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন কারো বিরুদ্ধে কোন তদন্ত করেছেন কিংবা শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। এ ক্ষেত্রে কমিশনের ভূমিকা দাঁড়িয়েছে মূলত দর্শকের।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪৪ এএ, ৪৪সি অনুযায়ী প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যের বিভাগওয়ারী বিবরণ

বিভাগের নাম	নির্বাচনী ব্যয়ের উৎসের বিবরণী (১৭এ)			সম্পদ ও দায়-দেনার বিবরণী (১৭বি)			নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী (১৭সি)		
	মোট প্রার্থী	**দাখিল করেছেন**	**দাখিল করেন নাই**	**মোট প্রার্থী**	**দাখিল করেছেন**	**দাখিল করেন নাই**	**মোট প্রার্থী**	**দাখিল করেছেন**	**দাখিল করেন নাই**
ঢাকা	৫৯৮	৪৫৫	১৪৩	৫৯৮	৪৫৫	১৪৩	৫৯৮	৪০৬	১৯২
চট্টগ্রাম	৪৫৫	৩০৫	১৫০	৪৫৫	৩০৫	১৫০	৪৫৫	২৫০	২০৫
খুলনা	২০৫	২০০	৫	২০৫	২০০	৫	২০৫	১৯৬	৯
রাজশাহী	৪১৫	৩৭৩	৪২	৪১৫	৩৭৩	৪২	৪১৫	৩৫৮	৫৭
সিলেট	১২৭	১০০	২৭	১২৭	১০০	২৭	১২৭	১০০	২৭
বরিশাল	১৩৮	১২৬	১২	১৩৮	১২৬	১২	১৩৮	১১৯	১৯
মোট	১৯৩৮	১৫৫৯	৩৭৯	১৯৩৮	১৫৫৯	৩৭৯	১৯৩৮	১৪২৯	৫০৯

সূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। (জেলাওয়ারী বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন: www.shujan.org)

এছাড়াও আইনের বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও অনেক প্রার্থী নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিলও করেন না। আমাদের জানামতে, কোন রাজনৈতিক দল এ পর্যন্ত কোন নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিল করে নি এবং কমিশনও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সকল

প্রার্থীদের জন্য ৩টি ছকে – ছক ১৭এ (নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস), ১৭বি (দায়-দেনার হিসাব) ও ১৭সি (নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণ) – আর্থিক তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক। এ সকল তথ্য প্রদানে অপারগতা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ১৯৩৮ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। এসকল প্রার্থীদের মধ্যে ১৫৫৯ জন ছক ১৭এ ও ১৭বি জমা দেন। অর্থাৎ ৩৭৯ জন প্রার্থী এ দু'টি ছক রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণের ক্ষেত্রে এ ব্যর্থতা আরো বেশি প্রকট। মোট ১৯৩৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৪২৯ জন ছক ১৭সি জমা দেন এবং ৫০৯ জন জমা দেননি। নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, মোট ৪০ জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে তথ্য জমা না দেয়ার কারণে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ আমরা অষ্টম জাতীয় সংসদের মেয়াদের শেষ প্রান্তে এসে পৌছেছি, কিন্তু নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্য না দেয়ার কারণে কোন প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

নির্বাচনী বিরোধ দ্রুততার সাথে মেটানোর ক্ষেত্রেও আমাদের নির্বাচন কমিশন একই ধরনের ব্যর্থতা প্রদর্শন করেছেন। নির্বাচনী বিরোধ দ্রুততার সাথে নিস্পত্তির লক্ষ্যে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের পরিবর্তে হাইকোর্টে মামলা দায়েরের বিধান *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* ১৯৭২-এ একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে যুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৬ সালে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচনী বিরোধ মীমাংসার লক্ষ্যে ৬টি বিভাগীয় ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। এর আগে প্রত্যেক জেলায় জেলা জজের অধীনে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল গঠিত হতো, যার সংখ্যা ছিল ৬১টি (কারণ ৩টি পাহাড়ী জেলাকে চট্টগ্রামের অধীন হিসেবে গণ্য করা হতো)। দুর্ভাগ্যবশত নির্বাচনী বিরোধের দ্রুত নিস্পত্তির ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ট্রাইব্যুনালও ব্যাপকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হলো যে, মামলা নিস্পত্তির ক্ষেত্রে আইনে কোন সময়-সীমা বেধে দেয়া নেই, ফলে সকল মামলা অনির্দিষ্টকালের জন্য ঝুলতেই থাকে।

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ২০০১ সালের নির্বাচনের পর হাইকোর্ট বিভাগে ৩১টি মামলা দায়ের করা হয়। অষ্টম জাতীয় সংসদের অন্তিমকাল পর্যন্ত ১৮টি মামলা খারিজ হয়ে যায় এবং ১৩টি মামলা এখনও বিচারাধীন রয়েছে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার ফলে বিচারাধীন মামলাগুলো এর সকল কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে।

আমাদের জানা মতে, এ পর্যন্ত একটি মাত্র মামলার (*শুধাংশু শেখর হালদার বনাম প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য*) রায় হয়েছে। জনাব আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* ১৯৭২-এর ৪৪এএ, ৪৪সি(১)(এ), ৪৪সি(২) ও ৪৪সি(৩) লঙ্ঘন করেছেন বলে ২০০৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর আদালত রায় দেন, যা উক্ত অধ্যাদেশের ৭৩(২) ও ৭৪(২) অনুযায়ী দুর্নীতিমূলক ও বেআইনী কার্যক্রম হিসেবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মাননীয় আদালত পিরোজপুর-১২৯ আসনের নির্বাচন বাতিল করেন, যদিও বাদী জনাব শুধাংশু শেখর হালদারকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়নি। এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল হয় এবং সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ প্রদান করেন। ইতোমধ্যে জনাব শুধাংশু শেখর হালদার পরলোক গমন করেছেন এবং পুরো মামলাটি এখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে (মামলার রায়টি 'সুজনে'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে)।

নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস ও বিরোধ দ্রুত নিস্পত্তির উপায়

সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে সত্যিকারের গণপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে হলে নির্বাচনী ব্যয় ব্যাপকভাবে হ্রাস ও নির্বাচনী বিরোধ দ্রুততার সাথে মেটাতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, নির্বাচনী ব্যয় ৫ লক্ষ টাকার নিচে নামানো প্রয়োজন এবং তা করাও সম্ভব। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও বিধানে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। একই সাথে এ সকল বিধি-বিধান কঠোরভাবে বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

নির্বাচনী ব্যয় হ্রাসের ক্ষেত্রে আইনের কিছু ফাঁক-ফোঁকর দূর করা প্রয়োজন। যেমন, আইনে বলা নেই কবে থেকে নির্বাচনী ব্যয় গণনা শুরু হবে। আমরা বিশ্বাস করি, নির্বাচনের এক বছর আগে থেকে নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে প্রার্থীর এমন সকল ব্যয় নির্বাচনী ব্যয় হিসেবে গণ্য করা প্রয়োজন। একই সাথে প্রার্থীর পক্ষে তার দলের কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির ব্যয়কেও প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের অন্তর্ভূক্ত হতে হবে। আইনী বিধানের মাধ্যমে সকল প্রার্থীকে এক বছর আগে থেকে সকল ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করতে বাধ্য করতে হবে।

নির্বাচনী ব্যয় হ্রাসের ক্ষেত্রে ২০০৫ সালের ২৪ মে তারিখে দেয়া হাইকোর্টের যুগান্তকারী রায়টি (আব্দুল মোমেন চৌধুরী বনাম বাংলাদেশ) প্রাসঙ্গিক হতে পারে। উক্ত রায়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদেরকে তাদের মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামার আকারে ৮ ধরনের তথ্য দেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আদালত এ সকল তথ্য গণমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে ভোটারদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ প্রদান করেন। হলফনামাগুলো অসম্পূর্ণ, অসত্য ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্যে ভরপুর হলেও, গত ৫টি উপনির্বাচনে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার এগুলোর ভিত্তিতে প্রার্থীদের প্রোফাইল তৈরি করে বিতরণ করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি, হাইকোর্টের নির্দেশনাকে জরুরি ভিত্তিতে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। এর সাথে অবশ্য প্রার্থী সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য প্রদান করা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। আর প্রার্থীদের প্রোফাইলে অন্তর্ভূক্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার পোস্টার ছেপে এবং লিফলেট তৈরি করে প্রার্থীদেরকে দিতে পারেন।

নির্বাচনী ব্যয়ের একটি বড় খাত প্রার্থীদের শো-ডাউন। এ সকল শোডাউন নির্বাচনের বহু পূর্ব থেকে শুরু হয় এবং মনোনয়নপত্র জমা দেবার সময় প্রায় সকল প্রার্থীই বড় আকারের শোডাউন করে থাকেন। এছাড়াও নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের মিটিং-মিছিল চলতে থাকে। ব্যয় বহুল এ সকল শোডাউন ও মিটিং-মিছিল-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রয়োজন। তার পরিবর্তে রিটার্নিং অফিসারগণ নির্বাচনী এলাকার একাধিক স্থানে প্রজেকশন মিটিং-এর আয়োজন করতে পারেন, যার মাধ্যমে নির্বাচনী ব্যয় ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে। উল্লেখ্য যে, গত তিনটি উপনির্বাচনে 'সুজন' প্রার্থীদের ভোটারদের মুখোমুখি করাতে সক্ষম হয়েছিল, যা ছিল একটি সৃজনশীল ও অনুপ্রেরণামূলক কার্যক্রম। পোস্টার ছাপানো এবং প্রজেকশন মিটিং আয়োজনের জন্য প্রত্যেক প্রার্থীকে তাদের নির্বাচনী ব্যয়ের একটি অংশ রিটানিং অফিসারকে দেওয়ার বিধান করা যেতে পারে। এছাড়াও ভোট কেনা-বেচা কঠোরভাবে দমন এবং নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা করতে হবে।

নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস করার জন্য নির্বাচন কমিশনের আন্তরিকতা ও দক্ষতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনী আইন ও বিধি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের রয়েছে। এছাড়াও *আলতাফ হোসেন বনাম আবুল কাসেম* (৪৫ডিএলআর(এডি)(১৯৯৩)) মামলার রায়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, সুষ্ঠু নির্বাচনের খাতিরে বিদ্যমান আইনের সাথে সংযুক্ত করার অধিকার নির্বাচন কমিশনের রয়েছে। তাই কমিশন ইচ্ছা করলেই আইনের কঠোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারেন। এর জন্য প্রয়োজন কমিশনের সদিচ্ছা ও গণমূখী দৃষ্টিভঙ্গি।

নির্বাচনী বিরোধ দ্রুত নিস্পত্তি করতে হলে বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা আবশ্যক, যার ফলে নির্বাচন কমিশনই বিরোধ মীমাংসার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ স্তর হতে পারে। যেমন, নির্বাচনী আইনের ছোটখাটো লঙ্ঘনের জন্য জেলা পর্যায়ে গঠিত নির্বাচনী ইনকুয়্যারি কমিটি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত দেবে, যার বিরুদ্ধে কমিশনে আপিল করা যাবে এবং কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

নির্বাচনী আইনের বড় ধরনের লঙ্ঘনের জন্য হাইকোর্টে মামলা দায়ের করার বিধান গুরুত্বপূর্ণ। তবে মামলা দায়েরের ৯০ দিনের মধ্যে মামলার নিস্পত্তি করার লক্ষ্যে হাইকোর্টে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বেঞ্চ সৃষ্টি করতে হবে। মামলার আপিলের ক্ষেত্রে ৯০ দিনের মধ্যে যাতে রায় চূড়ান্ত করা যায়, সে বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। এক কথায়, নির্বাচনী মামলা নিস্পত্তির একটি সময়সীমা থাকা প্রয়োজন। একইসাথে মামলায় বিজয়ীর জন্য মামলা সংক্রান্ত তার সকল ব্যয় আদায় করার বিধান করাও প্রয়োজন। এছাড়াও বিরোধ নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচিত ব্যক্তিকে শপথ গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে হবে।

মামলা শুনানীর ক্ষেত্রে কালক্ষেপণ যাতে না হয় সে লক্ষ্যে বারবার সময় নেওয়ার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করাও আবশ্যক। একইসাথে সংসদ সদস্যদের প্রিভেলেজড্ সংক্রান্ত আইনে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন, যাতে সংসদ অধিবেশন চলাকালীন সময়েও নির্বাচনী বিরোধের মামলার শুনানী হতে পারে। এছাড়াও হাইকোর্ট প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করার এবং রায়ের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন।

উপসংহার

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং ক্লিন বা পরিচ্ছন্ন সরকার সকল নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার। নির্বাচনী ব্যয়ের আধিক্যের এবং নির্বাচনী বিরোধের দীর্ঘসূত্রীতার ফলে এ অধিকার বর্তমানে নগ্নভাবে পদদলিত হচ্ছে। নির্বাচনে টাকার খেলা এবং অন্যায় আচরন বন্ধ করা না গেলেরাজনীতি হয়ে পড়বে ক্রমাগতভাবে আরো সৎ, যোগ্য ও মেধাবী মানুষ বিবর্জিত, যা আমাদের গনতন্ত্রের জন্য একটি অশনি সংকেত। আমাদের নির্বাচন কমিশনের অযোগ্যতা, অদক্ষতা ও সদিচ্ছার অভাব এর অন্যতম কারণ। কমিশন আন্তরিক হলেই রাজনীতিবিদদের এবং রাজনৈতিক দলের অসদাচারণ দূর করা সম্ভব হবে এবং আমাদের গণতন্ত্র গণমূখী রূপ নেবে। এজন্য আজ নাগরিক সমাজকে সক্রিয় ও সোচ্চার হতে হবে। কারণ বিখ্যাত আইনজ্ঞ ফেলিক্স ফ্রাঙ্কফার্টারের মতে, একটি রাষ্ট্রে নাগরিকের চেয়ে বড় কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ নেই।